বাংলা ভূখন্ডের ইতিহাস

বাংলাদেশের সাংবিধানিক নাম- গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ (The People's Republic of Bangladesh)
(সংবিধানের ১ নং অনুচ্ছেদ)

বাংলাদেশ স্বাধীনতা লাভ করেছে- ১৯৭১ সালের ১৬ই ডিসেম্বর।
বাংলাদেশের রাজধানী- ঢাকা এবং বাণিজ্যিক রাজধানী- চট্টগ্রাম।
বাংলাদেশের জাতীয় ও স্বাধীনতা দিবস পালন করা হয় ২৬শে মার্চ এবং বিজয় দিবস পালিত হয় ১৬ই ডিসেম্বর।

ভৌগলিক পরিচিতি

দক্ষিণ এশিয়ার উত্তর-পূর্বে ২০°৩৪´ উত্তর অক্ষরেখা হতে ২৬°৩৮´ উত্তর অক্ষরেখার মধ্যে এবং ৮৮°০১´ পূর্ব দ্রাঘিমা রেখা হতে ৯২°৪১´ পূর্ব দ্রাঘিমা রেখার মধ্যে বাংলাদেশের অবস্থান। বাংলাদেশের মাঝখান দিয়ে (মুন্সিগঞ্জ) অতিক্রম করেছে কর্কটক্রান্তি রেখা। বাংলাদেশের আয়তন ১,৪৭,৫৭০ বর্গ কিলোমিটার (৫৬,৯৭৭) বর্গ মাইল । আয়তনের ভিত্তিতে পৃথিবীতে বাংলাদেশের অবস্থান- ৯০তম।
অসংখ্য নদ-নদী পরিবেষ্টিত বাংলাদেশ প্রধানত সমতল ভূমি,পূর্ব ও দক্ষিণপূর্বে পাহাড়ি ভূমি। দেশের উল্লেখযোগ্য নদ-নদী হলো- পদ্মা, ব্রহ্মপুত্র, সুরমা, কুশিয়ারা, মেঘনা ও কর্ণফুলী।

সীমানা
বাংলাদেশের,

পশ্চিমে -- ভারতের পশ্চিমবঙ্গ
পূর্বে -- ভারতের ত্রিপুরা,আসাম,মিজোরাম
উত্তরে -- পশ্চিমবঙ্গ,আসাম ও মেঘালয়
দক্ষিণে -- বঙ্গোপসাগর

বাংলাদেশের সাথে সীমানা রয়েছে দু'টি দেশের(ভারত ও মিয়ানমার) । ভারতের সাথে সীমারেখা রয়েছে ৩৭১৫ কি. মি. জুড়ে এবং মিয়ানমারের সাথে ২৮০ কি. মি. জুড়ে । বাংলাদেশের মোট সীমানা দৈর্ঘ্য ৪৭১২ কি. মি. । বাংলাদেশের সমুদ্র সীমা ৭১৬ কিলোমিটার ধরে বিস্তৃত এবং রাজনৈতিক সমুদ্রসীমা ১২ নটিক্যাল মাইল।
বাংলাদেশের সীমান্তবর্তী জেলা- ৩২টি।

সর্ব দক্ষিণের
জেলা- কক্সবাজার
উপজেলা - টেকনাফ
স্থান - ছেঁড়াদ্বীপ

সর্ব উত্তরের
জেলা- পঞ্চগড়
উপজেলা - তেঁতুলিয়া
স্থান - বাংলাবান্ধা / জায়গীরজোত

সর্ব পূর্বের
জেলা - বান্দরবান
উপজেলা - থানচি
স্থান - আখাইনঠং

সর্ব পশ্চিমের
জেলা - চাঁপাইনবাবগঞ্জ
উপজেলা - শিবগঞ্জ
স্থান - মনাকশা

জাতীয় বিষয়াবলি

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের জাতীয় প্রতীক

স্বাধীনতার পরপরই বাংলাদেশের জাতীয় প্রতীক গ্রহণ করা হয়(সংবিধানের ৪(৩) অনুচ্ছেদ) । জাতীয় প্রতিকের মাঝে রয়েছে পানিতে ভাসমান বাংলাদেশের জাতীয় ফুল শাপলা, ফুলটিকে বেষ্টন করে আছে ধানের দুটি শীষ। চূড়ায় রয়েছে পরস্পর সংযুক্ত তিনটি পাটগাছের পাতা ও তার উভয়পার্শ্বে দুটি করে মোট চারটি তারকা। চারটি তারকা দিয়ে বাংলাদেশের সংবিধানের চারটি মুলনীতিকে নির্দেশ করা হয়। পানি,ধান ও পাট প্রতীকে বৈশিষ্ট্যমন্ডিত হয়েছে বাংলাদেশের নিসর্গ ও অর্থনীতি।

বাংলাদেশের জাতীয় প্রতীক

বাংলাদেশের মানুষ জাতি হিসেবে বাঙালি এবং নাগরিক হিসেবে বাংলাদেশী (সংবিধানের ৬(২) অনুচ্ছেদ) । সংবিধানের ৩ নং অনুচ্ছেদে 'বাংলা' কে রাষ্ট্র ভাষা উল্লেখ করা হয়েছে।

সংবিধানের ৪(১) নং অনুচ্ছেদে 'আমার সোনার বাংলা' গানটির প্রথম ১০ চরণকে জাতীয় সংগীত হিসেবে গ্রহণ করা হয়। গানটি সর্বপ্রথম প্রকাশিত হয় ১৯০৫ সালে বঙ্গদর্শন পত্রিকায়। বাউল সুরে রচিত জাতীয় সঙ্গীতের সুরকার ও রচয়িতা রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, তিনি সুরটি গ্রহণ করেন গগণ হরহকরার গানের সুর থেকে। কোন রাষ্ট্রীয় অনুষ্ঠানে জাতীয় সংগীতের প্রথম ৪টি চরণ বাজানো হয়। দেশাত্মবোধ সৃষ্টির লক্ষ্যে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে জাতীয় সংগীত পরিবেশনা বাধ্যতামূলক করা হয়েছে।

মানচিত্রখচিত প্রথম জাতীয় পতাকা, ডিজাইন করেন শিব নারায়ণ দাশ

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের বর্তমান পতাকাটি ১৯৭২ সালের ১৯ জানুয়ারি থেকে ব্যবহার করা হচ্ছে। বর্তমান পতাকাটির রূপকার শিল্পী কামরুল হাসান। ১০:৬ অনুপাতের আয়তক্ষেত্রের মাঝে খানিকটা বাম পাশে রয়েছে লাল বৃত্ত। পতাকার দৈর্ঘ্য ও বৃত্তটির ব্যাসার্ধের অনুপাত হচ্ছে ৫:১ ।

বাংলাদেশের বর্তমান জাতীয় পতাকা

জাতীয় পাখি	দোয়েল
জাতীয় মাছ	ইলিশ
জাতীয় পশু	রয়েল বেঙ্গল টাইগার
জাতীয় খেলা	হাডুডু (কাবাডি)

জাতীয় ফুল	শাপলা
জাতীয় ফল	কাঁঠাল
জাতীয় বৃক্ষ	আম গাছ
জাতীয় বন	সুন্দরবন

বাংলাদেশের জলবায়ুর ধরণ — উপ ক্রান্তীয় মৌসুমি জলবায়ু ।
বাংলাদেশের উষ্ণতম স্থান — নাটোরের লালপুর
সর্বনিম্ন বৃষ্টিপাত — নাটোরের লালপুর।
বাংলাদেশের শীতলতম স্থান — মৌলভীবাজারের শ্রীমঙ্গল
সর্বোচ্চ বৃষ্টিপাত — মৌলভীবাজারের শ্রীমঙ্গল
বাংলাদেশের মোট বিভাগ — ৮টি , জেলা —৬৪টি, সিটি কর্পোরেশন — ১২টি, পৌরসভা —৩৩০টি,
উপজেলা — ৪৯২টি ।

বাংলাদেশের শাসন ব্যবস্থা এককেন্দ্রিক এবং সরকার পদ্ধতি সংসদীয় গণতন্ত্র। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের রাষ্ট্র প্রধান হচ্ছেন —রাষ্ট্রপতি এবং সরকার প্রধান হচ্ছেন — প্রধানমন্ত্রী । বাংলাদেশের পার্লামেন্টের নাম — জাতীয় সংসদ (House of the Nation)

বাংলাদেশের জনসংখ্যা ১৬.১৭ কোটি (৮.১০ কোটি পুরুষ ও ৮.০৭ কোটি মহিলা) । জনসংখ্যার বৃদ্ধির হার: ১.৩৭%,
জন্মহার: প্রতি হাজারে ১৮.৮ জন ও মৃত্যুহার : প্রতি হাজারে ৫.১ জন।
জনসংখ্যার দিক দিয়ে পৃথিবীর ৮ম বৃহত্তম দেশ।
৪র্থ বৃহৎ মুসলিম দেশ, মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ দেশ হিসাবে বিশ্বের ৩য় দেশ,
জনসংখ্যার ঘনত্বের দিক দিয়ে বিশ্বের ৭ম বৃহৎ দেশ এবং ১০ কোটির উপর জনসংখ্যার দেশ হিসাবে বাংলাদেশ পৃথিবীর সবচেয়ে ঘনবসতিপূর্ণ দেশ। বাংলাদেশ গাঙ্গেয় বদ্বীপে অবস্থিত, যা পৃথিবীর সর্ববৃহৎ বদ্বীপ।
কক্সবাজার পৃথিবীর দীর্ঘতম প্রাকৃতিক সমুদ্র সৈকত।
বাংলাদেশে বর্তমান শিক্ষার হার ৬৩.৬% ।

অর্থনীতি

অর্জন : বাংলাদেশ D-8 এর সদস্য।
গোল্ডম্যান স্যাস কর্তৃক "Next Eleven Economy of the world" হিসেবে বিবেচিত।
মাথাপিছু আয় : $১,৭৫২ (সুত্র: বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা - ২০১৮)
জিডিপি প্রবৃদ্ধি (%) : ৭.৬৫ (সুত্র: বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা - ২০১৮)
দারিদ্র্যের হার : ২৪.৩% (সুত্র: বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা - ২০১৮)
মানব উন্নয়ন সূচকে অবস্থান : ১৩৯ তম
আন্তর্জাতিক অনুদান নির্ভরতা: ২%
প্রধান ফসল : ধান, পাট, চা, গম, আঁখ, ডাল, সরিষা, আলু, সবজি, ইত্যাদি।
প্রধান শিল্প : পোশাকশিল্প (পৃথিবীর ২য় বৃহত্তম শিল্প), পাট (বিশ্বের সর্ববৃহৎ উৎপাদনকারী), চা, সিরামিক, সিমেন্ট, চামড়া, রাসায়নিক দ্রব্য, সার, চিংড়ি প্রক্রিয়াজাত, চিনি, কাগজ, ইলেক্ট্রিক ও ইলেক্ট্রনিক্স সামগ্রী, ঔষধ, মৎস্য।
প্রধান রপ্তানি : পোশাক (পৃথিবীর ২য় বৃহত্তম শিল্প), হিমায়িত চিংড়ি, চা, চামড়া ও চামড়াজাত দ্রব্যাদি, পাট ও পাটজাত দ্রব্য (পাট উৎপাদনে বাংলাদেশ প্রথম), সিরামিক্স, আইটি আউটসোর্সিং, ইত্যাদি।
প্রধান আমদানি : গম, সার, পেট্রোলিয়াম দ্রব্যাদি, তুলা, খাবার তেল, ইত্যাদি।

প্রধান খনিজ সম্পদ : প্রাকৃতিক গ্যাস, তেল, কয়লা, চিনামাটি, কাচ বালি, ইত্যাদি।
মুদ্রা : টাকা (বিডিটি - প্রতীক ৳)

শিল্প-ভিত্তিক শ্রমিক বণ্টন:

কৃষি : ৪৮.৪%,

শিল্প : ২৪.৩%,

অন্যান্য : ২৭.৩%

বাংলাদেশের সমুদ্র বন্দর ৩টি (চট্রগ্রাম,মোংলা ও পায়রা) । ৩টি আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরসহ মোট ৮টি বিমানবন্দর রয়েছে। সর্বশেষ সিলেটের ভোলাগঞ্জ স্থল বন্দরসহ মোট ২৪টি স্থল বন্দর রয়েছে, তন্মধ্যে চালু রয়েছে ১৪টি।

বাংলাদেশের জাতীয় বিষয়াবলি

ইতিহাসের উপাদান

ইতিহাসের উপাদান হচ্ছে সেসব তথ্য-প্রমাণ যার সাহায্যে কোন ঐতিহাসিক সত্যকে প্রতিষ্ঠিত করা হয়। ইতিহাসের উপাদানকে দুই ভাগে ভাগ করা যায়।

১. লিখিত উপাদান ২. অলিখিত উপাদান

সাহিত্য,বৈদেশিক বিবরণ,দলিলপত্র ইত্যাদি হচ্ছে ইতিহাসের লিখিত উপাদান। ইতিহাসের কিছু লিখিত উপাদানের উদাহরণ হচ্ছে কৌটিল্যের 'অর্থশাস্ত্র', আবুল ফজলের 'আকবরনামা', মহিদাসের 'ঐতরেয় আরণ্যক' ও গোলাম হোসেন সলিমের 'রিয়াজ আস সালাতিন'।
'আকবরনামা' হচ্ছে আকবরের সভাসদ আবুল ফজল রচিত তিন খন্ডের এক বিশাল ইতিহাসগ্রন্থ এবং এর তৃতীয় খন্ডই হচ্ছে 'আইন-ই-আকবরী'। এই গ্রন্থেই সর্বপ্রথম দেশবাচক 'বাংলা' শব্দ ব্যবহৃত হয়। 'বঙ্গ' শব্দটি সর্বপ্রথম উল্লেখ করা হয় 'ঐতরেয় আওরণ্যক' গ্রন্থে। এ ছাড়াও মিনহাজ-উস সিরাজ রচিত 'তবকাত-ই-নাসিরী' গ্রন্থে বাংলায় মুসলিম শাসন প্রতিষ্ঠার গুরুত্বপূর্ণ তথ্য পাওয়া যায়।

মুদ্রা,শিলালিপি,স্তম্ভলিপি,তাম্রলিপি,ইমারত ও ইত্যাদি হচ্ছে ইতিহাসের অলিখিত উপাদান।
তামার পাতের উপর লেখাই ইতিহাসে তাম্রলিপি নামে পরিচিত।
প্রাচীনকালে রাজারা তামার পাতে খোদাই করে যেসব ঘোষণা বা নির্দেষ দিতেন সেগুলোকে তাম্রশাসন বলা হত। এ রকম ৭ টি তাম্রশাসন পাওয়া গেছে স্বাধীন বঙ্গ রাজ্য আমলের।

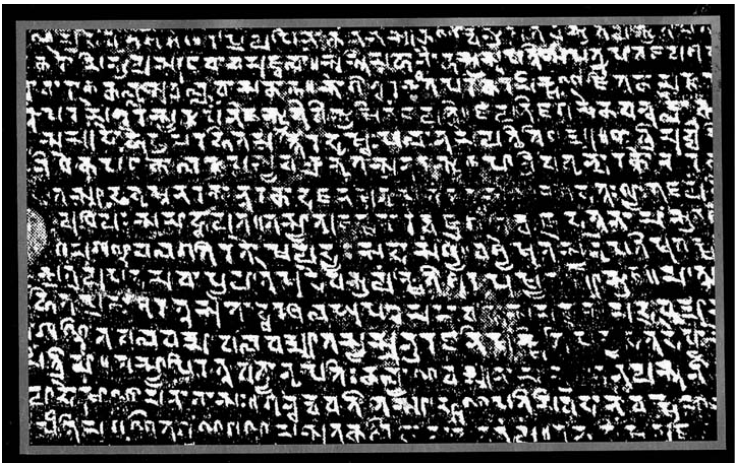

তাম্রশাসন (সূত্রঃ বাংলাপিডিয়া)

পরিব্রাজক

পর্যটকদের বলা হয় পরিব্রাজক। পরিব্রাজকদের বিবরণ ইতিহাসের একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান, আমাদের ইতিহাস পুনর্গঠনেও পরিব্রাজকদের বিবরণ খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

গ্রিক রাষ্ট্রদূত ও পরিব্রাজক মেগাস্থিনিস গ্রিক রাজা সেলিউকাসের আদেশে খ্রিষ্টপূর্ব ৩০২ অব্দে চন্দ্রগুপ্ত মৌর্যের রাজদরবারে আসেন এবং কয়েক বছর অবস্থান করেন। মৌর্য শাসন সম্পর্কে তাঁর সেই অভিজ্ঞতা তিনি 'ইন্ডিকা' নামক গ্রন্থে প্রকাশ করেন।
চৈনিক পরিব্রাজকদের মধ্যে সর্বপ্রথম তীর্থযাত্রী ফা-হিয়েন দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের শাসনামলে (৩৯৯ খিষ্টাব্দে) ভারতবর্ষে আসেন। ভারত ভ্রমণের শেষ পর্যায়ে তিনি সীমান্ত রাজ্য চম্পার মধ্য দিয়ে বাংলাদেশে প্রবেশ করেন। ভ্রমণের অভিজ্ঞতা সম্পর্কে তাঁর রচিত ৭টি গ্রন্থের মধ্যে 'ফো-কুয়ো-কিং' বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

চৈণিক তীর্থযাত্রী হিউয়েন সাং ৬৩০ খ্রিষ্টাব্দে ভারত সফরে এসে ১৪ বছর ভারতে অবস্থান করেন। তিনি হর্ষবর্ধনের দরবারে আট বছর কাটান এবং নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ শীলভদ্রের কাছে বৌদ্ধ ধর্মশাস্ত্র অধ্যয়ন করেন। 'সিদ্ধি' নামক গ্রন্থটি তিনি রচনা করেন। তিনি যেই স্থানগুলো ভ্রমণ করেন - কর্ণসুবর্ণের নিকটবর্তী রক্তমৃত্তিকা, পুন্ড্রনগর, সমতট, তাম্রলিপ্তি, ও কামরূপ অঞ্চল।

মরক্কোর ইবনে বতুতা একুশ বছর বয়সে ১৩২৫ খ্রিষ্টাব্দে বিশ্ব ভ্রমণে বের হন। সুলতান মুহাম্মদ বিন তুঘলক কর্তৃক দিল্লীর কাজী নিযুক্ত হওয়ার পর তিনি এই পদে আট বছর বহাল ছিলেন। ফখরুদ্দিন মুবারক শাহের রাজত্বকালে বাংলায় প্রবেশ করে তিনি সর্বপ্রথম পৌছান চট্টগ্রাম, যার নাম তিনি উল্লেখ করেন চাটগাঁও। হযরত শাহজালাল (রহ.) এর সাথে দেখা করতে তিনি সিলেট যান এবং সেখান থেকে নদীপথে তিনি সোনারগাঁও আসেন। ইবনে বতুতা 'সফরনামা' বইটি রচনা করেন এবং বাংলাদেশকে 'প্রাচুর্যপূর্ণ নরক' বলে অবিহিত করেন। "বাঙ্গালা" শব্দটি ব্যবহারকারী প্রথম বিদেশী পর্যটক তিনি

ইবনে বতুতা (source: silk-road.com)

চৈনিক পরিব্রাজক মা হুয়ান গিয়াসউদ্দীন আজম শাহের আমলে ১৪০৬ সালে দোভাষী হিসেবে বাংলায় আসেন। তিনি সোনারগাঁও ভ্রমণ করেন এবং তাঁর 'ইং ইয়াং শেং লান' নামক গ্রন্থে বাংলা ভ্রমণের বিবরণ দেন।

প্রাচীনকাল হতে সম-সাময়িক কালের ইতিহাস

বাঙালি জাতির উদ্ভব ও বিকাশ

খ্রিস্টীয় তেরো শতকের পূর্ব পর্যন্ত প্রায় দু' হাজার বছরের সময়কে বাংলার প্রাচীন যুগ ধরা হয়।
প্রাচীন যুগে বাংলা (বাংলাদেশ ও পশ্চিমবঙ্গ) বিভিন্ন ছোট ছোট অঞ্চলে বিভক্ত ছিল। এ অঞ্চলগুলোকে সমষ্টিগতভাবে নাম দেয়া হয় 'জনপদ'।
সমগ্র বাঙালি জনগোষ্ঠীকে প্রাক-আর্য (অনার্য) ও আর্য এই দুই ভাগে ভাগ করা হয়।

অস্ট্রিক জাতি (নিষাদ জাতি) থেকে বাঙালি জাতির প্রধান অংশ গড়ে উঠেছে। বাংলার আদি অধিবাসীগণ ছিল অস্ট্রিক ভাষাভাষী। দক্ষিণ ভারতের আদি অধিবাসী ছিল দ্রাবিড় জাতি। তাই এরাই বাংলাদেশের প্রাচীন জাতি।

ইউরাল পর্বতের দক্ষিণ তৃণভূমি অঞ্চল ছিল আর্যদের আদি বাসস্থান। ইরান থেকে খ্রিষ্টপূর্ব ২০০ অব্দে তারা এদেশে আসে। তারা প্রথমে ভারতের উত্তর পশ্চিম সীমান্ত অঞ্চল ও পাঞ্জাবে বসতি স্থাপন করে। সনাতন ধর্মালম্বী আর্যদের ধর্মগ্রন্থ ছিল বেদ।

নৃতাত্ত্বিকভাবে বাংলাদেশের মানুষ আদি অস্ট্রেলীয় নরগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত। বাঙালি জাতি সংকর জাতি হিসেবে পরিচিত। কোল, ভেল, সাঁওতাল, মুন্ডা ইত্যাদি বাংলার আদি উপজাতি।

রাখাল দাশ বন্দোপাধ্যায় আবিষ্কৃত সিন্ধু সভ্যতায় তাম্র-ব্রোঞ্জ যুগের নিদর্শন পাওয়া যায়।

সম্প্রতি আবিষ্কৃত নরসিংদীর উয়ারী-বটেশ্বর ছিল বাংলাদেশের প্রাচীনতম নগরী।

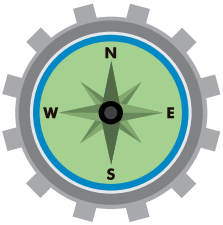

বাংলার প্রাচীন জনপদ ও শাসনামল

'পুন্ড্র' জাতি গড়ে তোলে প্রাচীন বাংলার সবচেয়ে সমৃদ্ধ ও সর্বপ্রাচীন জনপদ। পুন্ড্রদের রাজধানী ছিল পুন্ড্রনগর বা মহাস্থানগড়। পাথরের চাকতিতে খোদাই করা সম্ভবত বাংলাদেশে প্রাপ্ত প্রাচীনতম শিলালিপি এখানে পাওয়া গেছে। এর বিস্তৃতি ছিল বর্তমান বগুড়া, রাজশাহী ও দিনাজপুর জেলা জুড়ে।

পাণিনির গ্রন্থে সর্বপ্রথম গৌড় জনপদের উল্লেখ দেখা যায়। এছাড়াও কৌটিল্যের 'অর্থশাস্ত্র' গ্রন্থে ও ব্যাৎসায়নের গ্রন্থে গৌড়ের উল্লেখ পাওয়া যায়। চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলায় প্রাচীন গৌড় নগরীর অংশ বিশেষ অবস্থিত। সপ্তম শতকে গৌড়রাজ শশাঙ্কের রাজধানী ছিল কর্ণসুবর্ণ। পাল রাজাদের আমলে গৌড়ের নাম-ডাক ছিল সবচেয়ে বেশী।

মানচিত্রঃ প্রাচীন বাংলার জনপদ (source : onushilon.org)

গঙ্গা ও ভগীরথীর মাঝখানের অঞ্চলকেই বঙ্গ বলা হতো। বৃহত্তর বগুড়া, পাবনা, ময়মনসিংহ জেলার পশ্চিমাঞ্চল, ঢাকা, ফরিদপুর, কুষ্টিয়া, বৃহত্তর কুমিল্লা ও নোয়াখালীর কিছু অংশ নিয়ে বঙ্গ গঠিত হয়েছিল। বঙ্গ জনপদের উত্তরাঞ্চলের সীমা ছিল পদ্মা নদী। পাল বংশের শেষ পর্যায়ে বঙ্গ দুভাগে বিভক্ত হয়ে উত্তর বঙ্গ ও দক্ষিণ বঙ্গ নামে পরিচিত হয়। কেশব সেন ও বিশ্বরূপ সেনের আমলেও 'বিক্রমপুর' ও 'নাব্য' নামে বঙ্গের দুটি ভাগ ছিল। ফরিদপুর,বরিশাল ও পটুয়াখালীর নিম্ন জলাভূমি এ নাব্য অঞ্চলের অন্তর্ভুক্ত ছিল। 'বঙ্গ' থেকে 'বাঙালি' জাতির উৎপত্তি ঘটেছিল।

চীনা ভ্রমণকারী ইৎসিতের মতে হরিকেল ছিল পূর্ব ভারতের শেষ সীমানায়। শ্রীহট্ট (সিলেট) থেকে চট্টগ্রামের অংশবিশেষ পর্যন্ত হরিকেল জনপদ বিস্তৃত ছিল (মধ্যখানে সমতট রাজ্যের উপস্থিতি ছিল)। সপ্তম ও অষ্টম শতক থেকে দশ ও এগারো শতক পর্যন্ত হরিকেল একটি স্বতন্ত্র রাজ্য ছিল।

মনে করা হয় সমতট বর্তমান কুমিল্লার প্রাচীন নাম। কুমিল্লা ও নোয়াখালী অঞ্চল নিয়ে সমতট গঠিত হয়েছিল। কুমিল্লা শহরের ১২ মাইল পশ্চিমে বড় কামতা নামক রাজধানী ছিল। 'শালবন বিহার' নামক প্রাচীন নিদর্শনটি কুমিল্লার ময়নামতিতে অবস্থিত।

প্রাচীন নিদর্শন কুমিল্লার 'শালবন বিহার' (source: vromonguide.com)

গঙ্গা ও করতোয়া নদীর মধ্যবর্তী অঞ্চলে ছিল বরেন্দ্র বা বরেন্দ্র ভূমি জনপদের অবস্থান। বগুড়া, দিনাজপুর, রাজশাহী জেলার অনেকটা অঞ্চল ও পাবনা জেলা জুড়ে বরেন্দ্র অঞ্চল বিস্তৃত ছিল।
প্রাচীনকালে তাম্রলিপ্ত নৌ-বাণিজ্যের কেন্দ্র হিসেবে পরিচিত ছিল।
বর্তমান বরিশাল জেলা ছিল চন্দ্রদ্বীপের প্রাণকেন্দ্র। বরিশাল, পিরোজপুর, পটুয়াখালী, মাদারীপুর, গোপালগঞ্জ, খুলনা ও বাঘেরহাট এ জনপদের অন্তর্ভুক্ত ছিল।

খ্রিস্টপূর্ব ৪র্থ শতকে গঙ্গা নদীর দুটি স্রোত ভাগীরথী ও পদ্মার মধ্যবর্তী অঞ্চলে 'গঙ্গারিডি' জাতির বাসস্থান ছিল। তাদের রাজধানী ছিন পলিবোথরা (পাটালিপুত্র)।

ভারতীয় উপমহাদেশের প্রথম সাম্রাজ্যের নাম মৌর্য সাম্রাজ্য। ৩২১ খ্রিষ্ট পূর্বাব্দে মৌর্য সম্রাট চন্দ্রগুপ্ত মগধের সিংহাসনে আরোহণের মাধ্যমে এক বিশাল অঞ্চলের উপর এ সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন। পাটালিপুত্র ছিল চন্দ্রগুপ্তের রাজধানী আর প্রাচীন পুন্ড্রনগর ছিল এ প্রদেশের রাজধানী।
চন্দ্রগুপ্তের প্রধানমন্ত্রী ছিলেন চাণক্য , কৌটিল্য তাঁর ছদ্মনাম।
উত্তর বাংলায় মৌর্য শাসন প্রতিষ্ঠিত হয় সম্রাট অশোকের শাসনামলে (২৬৯-২৩২ খ্রিষ্টপূর্ব) । কলিঙ্গ যুদ্ধে সম্রাট অশোক কলিঙ্গ রাজাকে পরাজিত করেন। তাঁর আমলেই বৌদ্ধধর্ম রাজধর্মের স্বীকৃতি পায় ও বিশ্বধর্মের মর্যাদা পায়। তাঁকে 'বৌদ্ধধর্মের কনস্ট্যানটাইন' বলা হয়।

কনিষ্ক ছিলেন সর্বশ্রেষ্ঠ কুষাণ রাজা। তাঁর চিকিৎসক চরক আয়ুর্বেদ চিকিৎসা পদ্ধতির সর্বপ্রথম সংকলন গ্রন্থ 'চরক সংহিতা' রচনা করেন।

প্রথম চন্দ্রগুপ্তের মাধ্যমে ভারতে গুপ্ত সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হয় ৩২০ খ্রিষ্টাব্দে। তাদের রাজধানী ছিল পাটালিপুত্র ও গুপ্ত অধিকৃত বাংলার রাজধানি ছিল পুন্ড্রনগর। ভারতের ইতিহাসে একে 'স্বর্ণযুগ' ধরা হয়। গুপ্ত বংশের শ্রেষ্ঠ রাজা সমুদ্রগুপ্তকে 'প্রাচীন ভারতের নেপোলিয়ন' বলা হয়। দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের উপাধি ছিল- 'বিক্রমাদিত্য' এবং তাঁর শাসনামলেই গুপ্ত সাম্রাজ্য সবচেয়ে বিস্তৃত হয়। তাঁর দরবারে সমবেত হওয়া প্রতিভাবানদের মাঝে প্রধান নয়জনকে 'নবরত্ন' বলা হয়। এদের মাঝে কালিদাস, বরাহমিহির ও অমরসিংহ উল্লেখযোগ্য। গুপ্ত সাম্রাজ্যের পতনের পর বাংলাদেশে স্বাধীন বঙ্গ ও স্বাধীন গৌড় নামে দুটি স্বাধীন সাম্রাজ্যের সৃষ্টি হয়।

গুপ্ত সাম্রাজ্যের পতনের পর বাংলাদেশে স্বাধীন বঙ্গ ও স্বাধীন গৌড় নামে দুটি স্বাধীন সাম্রাজ্যের সৃষ্টি হয় ষষ্ঠ শতকে। স্বাধীন বঙ্গ রাজ্যের অবস্থান ছিল দক্ষিণ পূর্ব বাংলা ও পশ্চিম-বাংলার দক্ষিণাঞ্চলে। তাম্রশাসন থেকে জানা যায় যে, গোপচন্দ্র,ধরমাদিত্য ও সমাচারদেব 'মহারাজাধিরাজ' উপাধি গ্রহণ করে এ রাজ্য শাসন করতেন। স্বাধীন গৌড় রাজ্যের অবস্থান ছিল বাংলার পশ্চিম ও উত্তর বাংলা নিয়ে। গুপ্ত রাজা মহাসেন গুপ্তের মহাসামন্ত শশাঙ্ক ৫৯৪ খ্রিষ্টাব্দে গৌড় অঞ্চল দখল করে স্বাধীন গৌড় রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন। প্রাচীন জনপদগুলোকে গৌড়নামে একত্রিত করার ফলে তাঁর উপাধি ছিল রাজাধিরাজ। বাংলার প্রথম স্বাধীন ও সার্বভৌম রাজা শশাঙ্ক রাজধানী স্থাপন করেন মুর্শিদাবাদ জেলার কর্ণসুবর্ণে। শশাঙ্ক শৈব ধর্মের উপাসক ছিলেন।
হর্ষবর্ধন পুষ্যভূতি বংশের শ্রেষ্ঠ রাজা ছিলেন। তাঁর সভাকবি বানভট্ট রচিত বিখ্যাত গ্রন্থ- 'হর্ষচরিত' ।

শশাঙ্কের মৃত্যুর পর প্রায় একশত বছর রাজ্যে বিশৃঙ্খলা ও অরাজকতা ছিল,যাকে তাম্রশাসনে 'মাৎস্যান্যায়' বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে। পাল বংশের প্রথম রাজা গোপালের আগমনে এর ইতি ঘটে। পরবর্তীতে বৌদ্ধ ধর্মালম্বী পাল বংশের রাজারা ৪০০ বছর এদেশ শাসন করেন। পাল বংশের শ্রেষ্ঠ রাজা ছিলেন ধর্মপাল, তাঁর উপাধি ছিল বিক্রমশীল। দ্বিতীয় মহীপালের শাসনামলে সামন্ত দিব্যর নেতৃত্বে কৈবর্ত বিদ্রোহ বা সামন্ত বিদ্রোহ ঘটে। পাল বংশের সর্বশেষ রাজা ছিলেন মদনপাল। মদনপালের পৃষ্ঠপোষকতায় সন্ধ্যাকর নন্দী 'রামচরিত' রচনা করেন।

পাল বংশের পতনের পর বারো শতকের দ্বিতীয় ভাগে বাংলাদেশে হিন্দু ধর্মালম্বী সেন রাজবংশের সূচনা করেন সামন্ত সেন। সামন্ত সেনের পুত্র হেমন্ত সেনকে এ বংশের প্রথম রাজার মর্যাদা দেয়া হয়। সেন বংশের শ্রেষ্ঠ রাজা বিজয় সেন নিজেকে সামন্তরাজা থেকে স্বাধীন রাজা রূপে প্রতিষ্ঠা করেন। বল্লান সেন কৌলিন্য প্রথার প্রবর্তন করেন। 'দানসাগর' ও 'অদ্ভুতসাগর' গ্রন্থ দুটি তিনি রচনা করেন। অসমাপ্ত অদ্ভুদসাগর গ্রন্থটি তাঁর পুত্র লক্ষণ সেন সমাপ্ত করেন। লক্ষণ সেন ছিলেন সেন যুগের সর্বশেষ রাজা। তিনিই বাংলার শেষ হিন্দু রাজা।

বাংলায় মুসলিম ও স্বাধীন সুলতানী শাসন প্রতিষ্ঠা

ভারতীয় উপমহাদেশে মুসলিম শাসনের সূত্রপাত ঘটে মুহাম্মদ বিন কাসেমের হাত ধরে। হাজ্জাজ বিন ইউসুফের নির্দেশে তিনি সর্বপ্রথম সিন্ধুর দেবল শহরে উপস্থিত হন। মুহাম্মদ বিন কাসেম ৭১২ খ্রিষ্টাব্দে সিন্ধু ও মুলতানের রাজা দাহিরকে পরাজিত করেন। মুহাম্মদ বিন কাসেমের অকালমৃত্যুর পর গজনীর সুলতান মাহমুদ ১০০০ সাল থেকে ১০২৭ সাল পর্যন্ত উপমহাদেশের পশ্চিমাঞ্চলে ১৭ বার অভিযান চালান। তরাইনের দ্বিতীয় যুদ্ধে মুহাম্মদ ঘুরী পৃথ্বীরাজ চওহানকে পরাজিত করেন। সুলতান কুতুবউদ্দিন আইবেক মুহম্মদ ঘুরীর কৃতদাস হিসেবে জীবন শুরু করেন। তিনি ছিলেন উপমহাদেশে স্থায়ী মুসলিম শাসনের প্রতিষ্ঠাতা। দিল্লির কুতুব মিনারের নির্মাণ কাজ তিনি শুরু করেন এবং শেষ করেন তাঁর জামাতা সুলতান ইলতুৎমিশ। সুলতান ইলতুৎমিশকে দিল্লি সালতানাতের প্রকৃত প্রতিষ্ঠাতা বলা হয়। ইলতুৎমিশের কন্যা সুলতান রাজিয়া দিল্লির সিংহাসনে(১২৩৬) আরোহণকারী প্রথম মুসলমান নারী। ভারতের তোতাপাখি (বুলবুলে হিন্দ) বলা হয় আমির খসরুকে। মুহম্মদ বিন তুঘলক তাঁর কেন্দ্রীয় রাজধানী দিল্লি থেকে দেবগিরিতে স্থানান্তর করেন। তিনিই ভারতবর্ষে সর্বপ্রথম প্রতীকী মুদ্রার প্রচলন করেন। আমির তুরঘাই এর সন্তান তৈমুর লঙ ১৩৯৮ সালে ভারত আক্রমণ করেন। ইব্রাহীম লোদী ছিলেন দিল্লীর সর্বশেষ সুলতান। পানিপথ দিল্লী থেকে ৯০ কি.মি. উত্তরে যমুনা নদীর তীরে। এখানে তিনটি গুরুত্বপূর্ণ যুদ্ধ সংঘটিত হয়।

ইখতিয়ার উদ্দিন মুহম্মদ বখতিয়ার খলজি ১২০৪ খ্রিষ্টাব্দে রাজা লক্ষণ সেনকে পরাজিত করে নদিয়া দখল করেন এবং বাংলায় মুসলিম শাসনের সূচনা করেন। সুলতান শামসুদ্দিন ফিরোজ ও হজরত শাহজালাল (র.) তাঁর ৩৬০ আউলিয়া সহ গৌর গবিন্দকে পরাজিত করে সিলেটে অবস্থান করেন। তাঁর নামানুসারেই সিলেট অঞ্চলকে 'জালালাবাদ' বলা হতো।
দিল্লির সুলতানগণ দুইশত বছর (১৩৩৮-১৫৩৮) বাংলাকে তাদের অধিকারে রাখতে পারেনি। এ সময় বাংলার সুলতানরা স্বাধীনভাবে বাংলা শাসন করেন। মুবারক শাহ ছিলেন বাংলার প্রথম স্বাধীন সুলতান। তিনি সোনারগাঁওকে স্বাধীন ঘোষণা করেন। শামসউদ্দিন ইলিয়াস শাহ পুরো বাংলা অধিকার করেন।

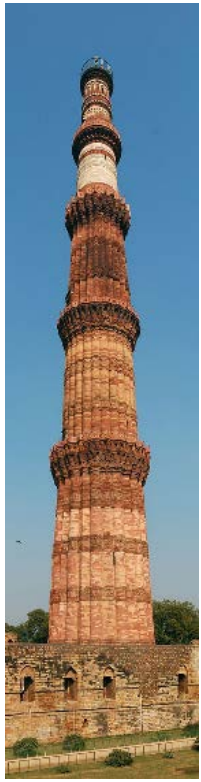

কুতুব মিনার দিল্লি,ভারত (সূত্রঃ উইকিপিডিয়া)

তাঁর শাসনামলেই বাংলা ভাষাভষী অঞ্চল 'বাঙ্গালা' নামে অভিহিত হয়। আলাউদ্দিন হুসেন শাহ ছিলেন বাংলার স্বাধীন সুলতানদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ। হিন্দু সম্প্রদায়ের প্রতি উদারতার ফলে কবি বিজয়গুপ্ত তাঁকে নৃপতি তিলক,জগৎ ভূষণ ও কৃষ্ণ-অবতার বলে উল্লেখ করেন। তাঁর শাসনামলেই শ্রীচৈতন্য বৈষ্ণব আন্দোলন গড়ে তোলেন এবং বৈষ্ণব ধর্ম প্রচার করেন। সুলতান নাসিরউদ্দিন নুসরাত শাহ বাগেরহাটের 'মিঠাপুকুর' খনন করেন। শেরশাহ ১৫৩৮ সালে গৌড় দখল করলে বাংলার শেষ স্বাধীন সুলতান নাসিরউদ্দিন মাহমুদ শাহ এর মাধমে স্বাধীন সুলতানদের যুগ শেষ হয়। শেরশাহ বাংলাদেশের সোনারগাঁও থেকে লাহোর পর্যন্ত ২৭০০ কি.মি. দীর্ঘ 'সড়ক-ই-আজম' নির্মাণ করেন। যা পরবর্তীতে ইংরেজরা 'গ্র্যান্ড ট্রাঙ্ক রোড' নামকরণ করে। শেরশাহ ভারতীয় উপমহাদেশে সর্বপ্রথম ডাক ব্যবস্থা চালু করেন।

মুগল শাসনামল

ক্রমান্বয়ে মুগল শাসকগণঃ বাবর ➞ হুমায়ূন ➞ আকবর ➞ জাহাঙ্গীর ➞ শাহজাহান ➞ আওরঙ্গজেব ➞ দ্বিতীয় বাহাদুর শাহ
১৫২৬ খ্রিষ্টাব্দে পানিপথের প্রথম যুদ্ধে ইব্রাহীম লোদীকে পরাজিত করে জহির উদ্দিন মুহাম্মদ বাবর ভারতে মুগল সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন। এ যুদ্ধে ভারতের ইতিহাসে সর্বপ্রথম কামান ব্যবহার করা হয়। সম্রাট বাবর ১৫২৮-২৯ সালে বাবরি মসজিদ নির্মাণ করেন। মসজিদটি ১৯৯২ সালে উগ্রবাদী হিন্দুগোষ্ঠী কতৃক ধ্বংস হয়।

বাবরি মসজিদ,অযোধ্যা,ভারত (সূত্রঃ আনন্দবাজার পত্রিকা)

সম্রাট জালাল উদ্দিন আকবর মাত্র তেরো বছর বয়সে দিল্লির সিংহাসনে বসেন। তাঁর শাসনামলেই মুগল সাম্রাজ্য সর্বাধিক বিস্তার লাভ করে। ১৫৮২ সালে তিনি 'দীন-ই-ইলাহী' নামক নতুন ধর্মের প্রবর্তন করেন। ফতেপুর সিক্রি নগরীর পত্তন ও আগ্রার দূর্গ তাঁরই অবদান। তাঁর পুত্র জাহাঙ্গীর ও নূরজাহান (বাল্য নাম মেহেরুন্নেসা) বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন। সম্রাজ্ঞী মমতাজের মৃত্যর পর শোকাহত সম্রাট শাহজাহান নির্মাণ করেন তাজমহল। সম্রাট আওরঙ্গজেবকে 'আলমগীর' ডাকা হতো। কুচবিহারের নাম রাখা হয়েছিল 'আলমগীরনগর'। সম্রাট আওরঙ্গজেব 'ফতোয়া-ই-আলমগীরী' নামক একটি আইন প্রণয়ন করেন। তাঁকে 'জিন্দাপীর' বলা হয়। মুহম্মদ শাহ এর শাসনামলে পারস্যের নাদির শাহ ভারত আক্রমণ করে মহামূল্যমান কোহিনুর হীরা, ময়ূর সিংহাসন এবং প্রচুর ধনরত্ন নিয়ে যান। শেষ মুঘল সম্রাট দ্বিতীয় বাহাদুর শাহ জাফর সিপাহি বিদ্রোহের পর ১৮৫৮ খ্রিষ্টাব্দে রেঙ্গুনে (বর্তমান ইয়াঙ্গুনে) নির্বাসিত হন।

তাজমহল আগ্রা,ভারত (সূত্রঃ উইকিপিডিয়া)

বারো ভূঁইয়া

বাংলার বড় বড় জমিদাররা মুঘলদের অধীনস্থ হননি এবং ভাটি অঞ্চলের জমিদারগণ নিজ নিজ স্থানে ছিলেন স্বাধীন। ভাটি অঞ্চলের এই জমিদারগণকে বলা হয় বারো ভূঁইয়া। তাঁদের নেতা ছিলেন ঈসা খাঁ এবং তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য—চাঁদ রায়, কেদার রায়, ফজল গাজী, রাম কৃষ্ণ ও পীতম্বর। ঈসা খাঁ সোনারগাঁয়ে রাজধানী স্থাপন করেন ও এগারসিন্ধুর (এগার নদীর সনযোগস্থল) গ্রামে শক্তিশালী ঘাটি গড়ে তোলেন।

বাংলায় সুবাদারি শাসন

ইসলাম খান বারো ভূঁইয়াদের দমন করে বাংলায় সুবাদারি শাসন প্রতিষ্ঠা করেন। তিনিই ১৬১০ সালে প্রথমবারের মত ঢাকাকে বাংলার রাজধানী করেন। সামসময়িক মুগল সম্রাট জাহাঙ্গীরের নামানুসারে ঢাকার নামকরণ করেন জাহাঙ্গীরনগর। তাঁর আমলেই ঢাকার 'ধোলাই খাল' খনন করা হয়। মুগল সম্রট শাহজাহানের দ্বিতীয় পুত্র ছিলেন শাহ সুজা। মীর জুমলা 'ঢাকা গেট' নির্মাণ করেন। শায়েস্তা খাঁ এর আমলে দ্রব্যমূল্যের দাম ছিল প্রচুর সস্তা। তাঁর আমলে এক টাকায় ৮ মণ চাল পাওয়া যেত।

নবাবি শাসন

মুর্শিদকুলী খান ছিলেন বাংলার প্রথম স্বাধীন নবাব। তিনি বাংলার রাজধানী ঢাকা থেকে মুর্শিদাবাদে স্থানান্তর করেন। আলীবর্দী খানের শাসনামলে মারাঠা সৈন্যদল বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যায় অনেকবার আক্রমণ করে। বাংলায় মারাঠা আক্রমণকারীরা 'বর্গী' নামে পরিচিত ছিল। বাংলার শেষ স্বাধীন নবাব ছিলেন আলীবর্দী খানের দৌহিত্র সিরাজউদ্দৌলা। মীর্জা মোহাম্মদ তাঁর প্রকৃত নাম। ১৭৫৬ সালের ১০ এপ্রিল মাত্র ২২ বছর বয়সে তিনি সিংহাসনে আরোহণ করেন। ১৭৫৭ সালের ২৩ জুন ভাগীরথী নদীর তীরে পলাশীর প্রান্তরে নবাব ইংরেজদের সাথে যুদ্ধে লিপ্ত হন। পলাশীর যুদ্ধক্ষেত্রে নবাবের প্রধান সেনাপতি মীর জাফর, জগৎশেঠ, রায়দুর্লভ, ইয়ারলতিফ, উমিচাঁদ প্রমুখ নিষ্ক্রিয় দর্শকের ভূমিকা পালন করেন। মীরমদন ও মোহনলাল ইংরেজদের উপর কঠিন আঘাত হানলেও গোলার আঘাতে মীরমদন মারা যান। দেশদ্রোহীদের ষড়যন্ত্রে নবাব পরাজিত হন। পলাশীর যুদ্ধে নবাবের এই পরাজয়ের সাথে বাংলার স্বাধীনতার সূর্য অস্তমিত হয়। মীর জাফরের জামাতা মীর কাসিম অযোধ্যার নবাব সুজাউদ্দৌলা ও মুগল সম্রাট দ্বিতীয় শাহ আলমের সঙ্গে জোট গঠন করে ইংরেজদের বিরুদ্ধে অবস্থান নেন। ১৭৬৪ সালে বক্সারের যুদ্ধে এ মিত্রবাহিনী ইংরেজদের কাছে পরাজিত হলে উপমহাদেশে ইংরেজরা নিশ্চিতভাবে প্রতিষ্ঠা লাভ করে।

নবাব সিরাজউদ্দৌলা (সূত্রঃ উইকিপিডিয়া)

ইউরোপীয়দের আগমন

পর্তুগিজদের মধ্যে সর্বপ্রথম দুঃসাহসী নাবিক ভাস্কো-ডা-গামা ১৪৯৮ সালে ভারতের কালিকট বন্দরে এসে উপস্থিত হন। ফলে ইউরোপীয় বণিকদের মাঝে পর্তুগিজ বণিকরাই ভারতীয় উপমহাদেশে বাণিজ্য করতে আসে সবার আগে। পর্তুগিজরা বাংলাদেশে ফিরিঙ্গি নামে পরিচিত। ১৫১৮ সালে চট্রগ্রামে পর্তুগিজদের আগমনে চট্রগ্রামের সমৃদ্ধি ঘটে এবং চট্রগ্রাম বাণিজ্য কেন্দ্রে পরিণত হয়ে 'পোর্টো গ্রান্ডে' নামে পরিচিত হয়। ১৫৩৮ সালে শেরশাহ পর্তুগিজদের চট্রগ্রাম থেকে বিতাড়িত করেন। আরাকানদের অধীনে থাকাকালে (১৫৮১-১৬৬৬) চট্রগ্রামে পর্তুগিজ ও আরাকান জলদস্যুদের আক্রমণ খুব বৃদ্ধি পায়। তাদেরকে 'হার্মাদ' বলা হতো। ১৬৬৬ সালে শায়েস্তা খান তাদেরকে চট্রগ্রাম হতে বিতাড়িত করে চট্রগ্রামের নাম রাখেন 'ইসলামাবাদ' ।

হল্যান্ডের অধিবাসী ওলন্দাজ বা ডাচরা 'ডাচ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি' গঠন করে ১৬০২ খ্রিষ্টাব্দে উপমহাদেশে আসে। ইংরেজদের কাছে বিদারার যুদ্ধে পরাজিত হয়ে তারা উপমহাদেশ ছেড়ে যেতে বাধ্য হয়। দিনেমার বা ডেনমার্কের একদল বণিক 'ডেনিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি' গঠন করে ব্যবসায় লাভ করতে না পেরে এদেশ ত্যাগ করে।

২১৮ জন ইংরেজ বণিক ১৬০০ সালে 'ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি' গঠন করে রাণী এলিজাবেথের কাছ থেকে প্রাচ্যে ১৫ বছর বাণিজ্য করার সনদপত্র লাভ করে। ক্যাপ্টেন হকিন্স ১৬০৮ সালে জেমসের সুপারিশপত্র নিয়ে সম্রাট জাহাঙ্গীরের সাথে দেখা করেন এবং তার ফলে ১৬১২ সালে সুরাটে বাণিজ্য কুঠি স্থাপিত হয়। ১৬১৫ সালে প্রথম জেমসের দূত হয়ে টমাস রো জাহাঙ্গীরের দরবারে আসেন এবং ইংরেজদের জন্য বাণিজ্যিক সুবিধা আদায় করে নেন। পরবর্তীকালে তারা সুরাট আগ্রা, আহমেদাবাদ, হুগলি সহ প্রভৃতি স্থানে বাণিজ্য কুঠি স্থাপন করে এবং করমন্ডল (মাদ্রাজ শহর) উপকূলে একটি দুর্গ নির্মাণে সক্ষম হয়। পরবর্তীকালে কোম্পানির এজেন্ট জব চার্নক প্রতিষ্ঠিত সুতানটি নগরের পাশের কলকাতা ও গোবিন্দপুর তারা কিনে নেয়। হুগলী নদীর তীরে গড়ে উঠে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির শাসনকেন্দ্র বিখ্যাত শহর কলকাতা। ১৬৯৬-১৭০৬ সালে কলকাতায় ইংল্যান্ডের রাজা উইলিয়ামের নামানুসারে 'ফোর্ট উইলিয়াম দুর্গ' নির্মিত হয়।

East India House Leadenhall street,London, Drawing by Thomas Shepherd

বাণিজ্যের উদ্দেশ্যে ইউরোপীয় বণিকদের মধ্যে সর্বশেষে উপমহাদেশে আসে ফরাসি বণিকরা। পলাশীর যুদ্ধে বাংলার নবাবের পক্ষে তাদের সমর্থন ছিল। বেশ কিছু বাণিজ্য কুঠি স্থাপন করলেও ১৭৫৭ সালে নবাবের হার ও ১৭৬০ সালে বন্দীবাসের যুদ্ধে ইংরেজদের কাছে পরাজিত হলে তাদের কুঠিগুলো ইংরেজদের দখলে চলে যায়।

ইংরেজ শাসন

১৭৬৫ সালে এলাহাবাদের চুক্তি অনুসারে বাংলার বিচার ও শাসন ক্ষমতা থাকে নবাবের হাতে এবং রাজস্ব আদায়ের ক্ষমতা পায় ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি। যা ইতিহাসে 'দ্বৈতশাসন' নামে পরিচিত। বাংলা ১১৭৬ (ইংরেজি ১৭৭০) সালে অনাবৃষ্টি ও খরায় বাংলায় এক বিশাল দুর্ভিক্ষের সৃষ্টি হয়ে প্রায় ১ কোটি মানুষ মৃত্যুবরণ করে। এই মহাদুর্ভিক্ষ ইতিহাসে 'ছিয়াত্তরের মন্বন্তর' নামে পরিচিত। ১৭৭২ সালে দ্বৈতশাসনের অবসান ঘটে। লর্ড ওয়ারেন হেস্টিংস ১৭৭২ সালে বাংলার গভর্নর নিযুক্ত হয়ে ভারতে ব্রিটিশ সাম্রাজ্য বিস্তারের সূচনা করেন এবং উপমহাদেশের প্রথম রাজস্ব বোর্ড স্থাপন করেন। লর্ড কর্ণওয়ালিস ১৭৮৬ সালে গভর্নর জেনারেল নিযুক্ত হন। তিনি ১৭৯৩ সালে চিরস্থায়ী ভূমি বন্দোবস্ত ব্যবস্থা প্রবর্তন করেন। উপমহাদেশের শেষ গভর্নর জেনারেল ও প্রথম ভাইসরয় লর্ড ক্যানিং ভারতীয় উপমহাদেশে পুলিশ ব্যবস্থা এবং কাগজের মুদ্রা প্রবর্তন করেন। 'হান্টার কমিশন' হল লর্ড রিপন কর্তৃক গঠিত শিক্ষা কমিশন।

লর্ড উইলিয়াম বেন্টিঙ্ক রাজ্যবিস্তারের চেয়ে সমাজসেবায় অধিক আগ্রহী ছিলেন। রাজা রামমোহন রায়ের সক্রিয় উদ্যোগ ও সহযোগিতায় তিনি সতিদাহ প্রথা রহিত করেন। লর্ড ডালহৌসি বিধবা বিবাহ আইন (The Hindu Widow's Re-marriage Act,1856) প্রণয়ন করেন। উপমহাদেশে টেলিগ্রাফ ও রেল যোগাযোগ ব্যাবস্থাও স্থাপন করেন তিনি।

বঙ্গভঙ্গ

সিপাহী বিপ্লবের তাৎক্ষণিক ফলাফল ছিল উপমহাদেশে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির শাসনের ইতি। ১৮৫৮ সালে উপমহাদেশের শাসনভার রানী ভিক্টোরিয়াকে দেয়া হয়। মহারানীর রাজপ্রতিনিধি হিসেবে গভর্নর জেনারেলকে বড়লাট বা ভাইসরয় উপাধি দেয়া হয়। বাংলা, বিহার, উড়িষ্যা, মধ্যপ্রদেশ ও আসামের কিছু অংশ নিয়ে গঠিত ছিল বাংলা প্রদেশ বা বাংলা প্রেসিডেন্সি। ১৮৫৩ থেকে ১৯০৩ পর্যন্ত বঙ্গভঙ্গের নানা প্রস্তাব ও পরিকল্পনা ব্যর্থ হয়। অবশেষে ১৯০৫ সালে লর্ড কার্জন বাংলা ভাগ করেন। বাংলাদেশের ঢাকা, চট্রগ্রাম, রাজশাহী, আসাম, জলপাইগুড়ি, পার্বত্য ত্রিপুরা ও মালদহ নিয়ে গঠিত হয় পূর্ব বাংলা ও আসাম প্রদেশ, যার রাজধানী হয় ঢাকা।

বঙ্গভঙ্গ (source: tutorialspoint.com)

লর্ড হার্ডিঞ্জ বঙ্গভঙ্গ রদের সুপারিশ করেন। ১৯১১ সালে পঞ্চম জর্জ বঙ্গভঙ্গ রদের ঘোষণা দেন যার ফলশ্রুতিতে পূর্ব ও পশ্চিম বাংলাকে একত্রিত করে 'বেঙ্গল প্রদেশ' সৃষ্টি করা হয়। তৎকালীন শ্রীহট্ট (বর্তমানে সিলেট) আসাম প্রদেশের অন্তর্গত ছিল যার কারনে সিলেটের ভাষা ও সংস্কৃতিতে আসামের প্রভাব লক্ষনীয়। ভারতের শেষ গভর্নর জেনারেল ও ভাইসরয় লর্ড মাউন্টব্যাটেন ১৯৪৭ সালের ৩ জুন ভারতবর্ষকে দ্বি-জাতিতত্ত্বের ভিত্তিতে পাকিস্তান ও ভারত নামে দুটি রাষ্ট্রে বিভক্ত করার ঘোষণা দেন। তিনি স্যার সিরিল জন র‍্যাডক্লিফকে সীমানা নির্ধারনকারী কমিশনের চেয়ারম্যান নিযুক্ত করেন। তার নামানুসারেই ভারত ও পাকিস্তানকে বিভিক্তকারী সীমারেখার নামকরণ করা হয় র‍্যাডক্লিফ লাইন। ১৯৪৭ সালের ১৪ আগস্ট পাকিস্তান ও ১৫ আগস্ট ভারত নামক দুটি রাষ্ট্রের জন্ম হয়।

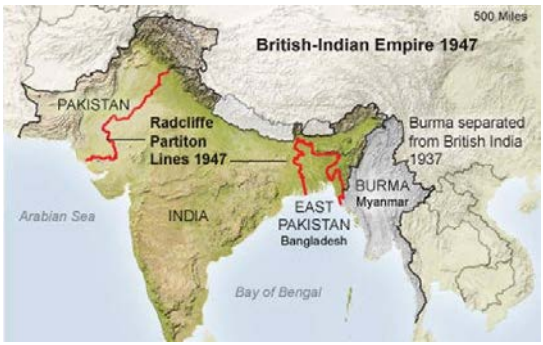

রেডক্লিফ লাইন ১৯৪৭ (source : India Today)

ভারতীয় উপমহাদেশে বিভিন্ন বিদ্রোহ

ফকির-সন্যাসী আন্দোলন ছিল ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি ক্ষমতা লাভের পর সর্বপ্রথম ব্রিটিশবিরোধী আন্দোলন। ১৭৬০ সালে পশ্চিমবঙ্গের বর্ধমান জেলায় সন্ন্যাসীরা ইংরেজদের বিরুদ্ধে প্রথম বিদ্রোহ শুরু করে। ফকির দলের নেতা ছিলেন মজনু শাহ এবং সন্ন্যাসী দলের নেতা ছিলেন ভবানী পাঠক। ১৮০০ সালে ফকির-সন্ন্যাসীরা ইংরেজদের কাছে চূড়ান্তভাবে পরাজিত হয়। চাকমা রাজা জোয়ান বক্স ইংরেজদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করলে ইংরেজরা বার বার চেষ্টা করেও তাঁকে দমন করতে পারেননি। ফলশ্রুতিতে ইংরেজরা রাজা জোয়ান বক্সের সাথে সন্ধি স্থাপন করে।

মীর নিসার আলী ওরফে তিতুমীর চব্বিশ পরগনা জেলার বারাসাত মহকুমার চাঁদপুরে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ১৮৩১ সালে নারিকেলবাড়িয়ায় বাঁশের কেল্লা নির্মাণ করেন। ইংরেজদের সাথে নারিকেলবাড়িয়ার যুদ্ধে তিনি ও তাঁর চল্লিশজন সহচর শহীদ হন। ব্রিটিশ আমলে বাংলাদেশে যে সব আন্দোলন হয়েছিল তার মধ্যে ফরায়েজী আন্দোলন ছিল প্রধান। এ আন্দোলনের কেন্দ্র ছিল ফরিদপুর। ফরায়েজী আন্দোলনের সূত্রপাত ঘটে হাজী শরীয়তুল্লাহর হাত ধরে। তাঁর মৃত্যুর পরে তাঁর সন্তান মুহসিনুদ্দীন ওরফে দুদু মিয়া আন্দোলনের নেতৃত্ব নিলে ধীরে ধীরে এই সংস্কার আন্দোলন রাজনৈতিক আন্দোলনে রূপ নেয়। ১৭৭০ থেকে ১৭৮০ সালের মধ্যে ইংরেজরা কৃষকদের দাদন গ্রহণে বাধ্য করে বাংলার উর্বর মাটিতে ফসলের পরিবর্তে নীল চাষ শুরু করতে বাধ্য করে। নানা সমস্যায় ক্রমাগত নীলচাষ চাষীদের জন্য অসম্ভব হয়ে দাঁড়ায়। দেয়ালে পিঠ ঠেকে গেলে নীল চাষিরা ১৮৫৯ সালে বিদ্রোহে ফেটে পড়ে। চাপের মুখে ইংরেজরা ১৮৬১ সালে 'নীল কমিশন' গঠন করে।

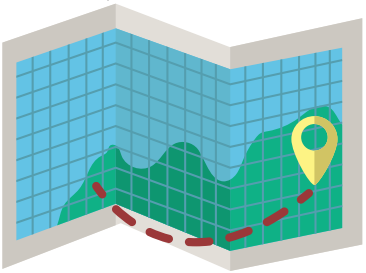

১৮৫৭ সালের সিপাহী বিপ্লব ছিল সারা ভারতের স্বাধীনতার জন্য ইংরেজদের বিরুদ্ধে প্রথম বিদ্রোহ। সিপাহী বিদ্রোহীরা চার মাস দিল্লি অবরোধ করে রাখতে সক্ষম হয়। সিপাহী বিদ্রোহের নেতৃত্বে ছিলেন মুগল সম্রাট দ্বিতীয় বাহাদুর শাহ। বিদ্রোহীদের ফাঁসি দিয়ে তাদের লাশ এনে ঝুলিয়ে রাখা হয় ঢাকার সদরঘাটে অবস্থিত ভিক্টোরিয়া পার্কে। ১৯৫৭ সালে মুগল সম্রাট দ্বিতীয় বাহাদুর শাহের নাম অনুসারে ভিক্টোরিয়া পার্কের নামকরণ করা হয় 'বাহাদুর শাহ পার্ক' ।

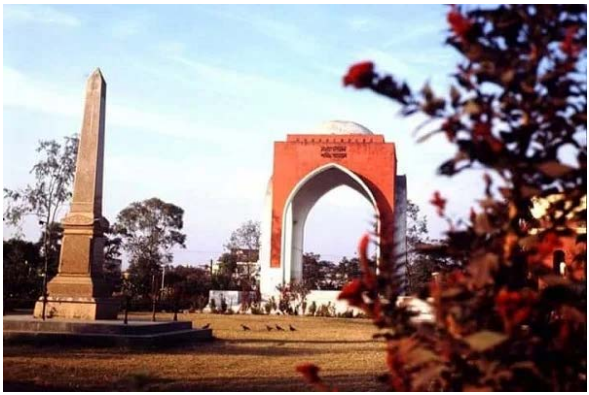

বাহাদুর শাহ পার্ক (source : daily-bangladesh.com)

লর্ড বেন্টিঙ্ক উপমহাদেশে পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রবর্তক। ১৮৩৫ সালে সরকারি ভাষা হিসেবে এদেশে ইংরেজির ব্যবহার শুরু হয়। বাংলার সংস্কার আন্দোলনে কিছু ব্যাক্তির অবদান অপরিসীম। 'দানবীর' বা 'বাংলার হাতেম তাই' নামে পরিচিত হাজী মুহম্মদ মুহসীন গরীব মেধাবী ছাত্রদের জন্য 'মুহসীন তহবিল' গঠন করেন। নওয়াব আব্দুল লতিফ ১৮৬২ সালে বাংলার আইন পরিষদের প্রথম মুসলিম সদস্য হওয়ার সম্মান লাভ করেন। ১৮৬৩ সালে কলকাতায় তাঁর প্রতিষ্ঠিত মুসলিম সাহিত্য সমাজ (মোহামেডান লিটারারি সোসাইটি) মুসলমানদের ইংরেজি শিক্ষা গ্রহণে আগ্রহী করে তোলে। স্যার সৈয়দ আহমদ প্রতিষ্ঠিত 'মোহামেডান অ্যাংলো-ওরিয়েন্টাল কলেজ' ১৯২০ সালে 'আলীগড় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয়' এ রূপান্তরিত হয়। দাদাভাই নওরোজি ছিলেন ব্রিটিশ পার্লামেন্টের ভারতীয় সদস্য। ১৯০৬ সালে নবাব সলিমুল্লাহর উদ্যোগে ঢাকায় প্রতিষ্ঠিত হয় মুসলীম লীগ বা নিখিল ভারত মুসলিম লীগ।

ব্রিটিশ সরকারের বঙ্গভঙ্গের বিরুদ্ধে কংগ্রেসের উগ্রপন্থী অংশের নেতৃত্বে যে আন্দোলন গড়ে উঠে,তাঁকে স্বদেশী আন্দোলন বলা হয়। কিংস ফোর্ডের গাড়িতে বোমা নিক্ষেপ করেন ক্ষুদিরাম। পরে ধরা পরলে মাত্র আঠারো বছর বয়সে তাঁকে ফাঁসিতে ঝোলানো হয়। চট্রগ্রামের বিপ্লবী মাস্টার দা সূর্যসেন তাঁর দলবল নিয়ে চট্রগ্রাম অস্ত্রাগার লুন্ঠন করেন ১৯৩০ সালে। এটি বাংলার সশস্ত্র আন্দোলনের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ঘটনা। সেদিন পাহাড়তলীর ইউরোপিয়ান ক্লাব আক্রমনের পরিকল্পনা থাকলেও গুড ফ্রাইডে তে ক্লাব ফাঁকা থাকায় তা আর হয়নি। পরবর্তীকালে ১৯৩২ সালে সূর্যসেনের আদেশে প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদার ইউরোপিয়ান ক্লাব সফলভাবে আক্রমণ করেন। ওইদিন গুলিবিদ্ধ প্রীতিলতা ওয়েদ্দেদার পটাশিয়াম সায়ানাইড খেয়ে মৃত্যুবরণ করেন।

ভারতীয় জাতির জনক মহাত্মা গান্ধী। রাওলাট আইন ও জালিয়ান ওয়ালাবাগ হত্যাকান্ডের প্রতিবাদে তিনি অসহযোগ আন্দোলনের ডাক দেন। ১৯৩৭ সালের প্রাদেশিক নির্বাচনে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস ৫২, মুসলিম লীগ ৩৯ ও কৃষক প্রজা পার্টি ৩৬ টি আসন লাভ করে। এ কে ফজলুল হকের নেতৃত্বে মুসলিম লীগ ও কৃষক প্রজা পার্টির কোয়ালেশন সরকার গঠিত হয়। অবিভক্ত বাংলার প্রথম মুখ্যমন্ত্রী নির্বাচিত হন এ কে ফজলুল হক। এ কে ফজলুল হক বাংলার বাঘ (শেরেবাংলা) নামে পরিচিত। তিনি অবৈতনিক প্রাথমিক শিক্ষা আইনের প্রবর্তক। তিনি ১৯৪০ সালে লাহোরে অনুষ্ঠিত নিখিল ভারত মুসলিম লীগের অধিবেশনে 'লাহোর প্রস্তাব' উত্থাপন করেন। লাহোর প্রস্তাবে তিনি মুসলিম অধ্যুষিত এলাকাগুলো নিয়ে একাধিক স্বাধীন ও সার্বভৌম রাষ্ট্র গঠনের প্রস্তাব দেন। তেভাগা আন্দোলনের নেতৃত্ব দেন ইলা মিত্র ও হাজী মোহাম্মদ দানেশ। আন্দোলনের দাবি ছিল - মোট উৎপন্ন ফসলের দুইভাগ পাবে চাষী আর একভাগ পাবে জমির মালিক। ১৯৪৬ সালের প্রাদেশিক পরিষদ নির্বাচনে মুসলিম লীগ জয় লাভ করলে হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর নেতৃত্বে মন্ত্রিসভা গঠিত হয়।

এ কে ফজলুল হক (সূত্রঃ বাংলাপিডিয়া)